আজকের কাগজ
তারিখ 13 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

অভিমত

বাংলাদেশে কলেজ জাতীয়করণ এবং শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড

মানুষ যে এই কঠিন বিপদসংকুল পৃথিবীতে নিজের ঠাঁই করতে পেরেছে তা তার শিক্ষার জন্যে। মানুষই একমাত্র প্রাণী যে শিখতে জানে এবং তাঁর শিক্ষা সে অন্যের মাঝে সঞ্চারিত করতে পারে। সেই আদিম প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মানুষ শিখে আসছে এবং তার সেই শিক্ষার কিন্তু আজও শেষ নেই। অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার অদম্য স্পৃহা মানুষের মনকে করে আন্দোলিত।

নিজেকে শিক্ষিত করে তোলার স্পৃহা থেকে সমস্ত জ্ঞানের দরোজা খুলে গেছে। আদিম সাম্যবাদী সমাজের লোক-শিক্ষার জগত থেকে বর্তমান যুগের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জগতে মানুষ প্রবেশ করেছে সভ্য সমাজের শুরু থেকেই। সভ্য সমাজের প্রারম্ভেই আমরা দেখতে পাই-প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। এই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে তার জ্ঞানের স্বীকৃতি দিয়েছে, দিয়েছে তার সৃজনশীলতা বৃদ্ধির সুযোগ। সভ্য সমাজের যতোই বিস্তার ঘটেছে ততোই আমরা দেখতে পাচ্ছি সমাজের কাঠামোগত পরিবর্তন। সেই পুরাতন স্থবির সমাজের কৌলিণ্যভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা আজ আর নেই। আধুনিক সভ্যতাই মানুষকে আত্মমর্যাদাশীল মানুষ হিসাবে সম্মান জানিয়েছে, স্বাগত জনিয়েছে তার প্রতিভাকে তার বংশ গরিমাকে নয়। সমগ্র উন্নত বিশ্বে তাই আজ প্রতিযোগিতার যুগ, মেধার যুগ, কর্মকুশলতার যুগ বংশগরিমা, রক্তের সম্পর্কের সেই মিথ্যা দাম্ভিকতার দিন শেষ হয়ে গেছে।

বাংলাদেশকেও তাই আজ তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্যেই চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে-উন্নত বিশ্বের সমপর্যায়ভুক্ত হওয়ার জন্যে। এই সমপর্যায়ভুক্ত হওয়ার মূল শর্তই হলো শিক্ষা। কারণ শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। যে জাতি যতো বেশি শিক্ষিত সে জাতি ততো বেশি উন্নত। শিক্ষার সঙ্গে উন্নয়নের একটি গভীর যোগাযোগ রয়েছে। অতএব এই কথা স্মরণ রেখে এই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা করতে হবে আরো বেশি আধুনিক গতিশীল, প্রতিযোগিতামূলক ও বিজ্ঞানভিত্তিক। এই দেশের জনসাধারণকে সেই শিক্ষাই দিতে হবে যে, শিক্ষা করবে তাকে বিজ্ঞানমনস্ক। বাংলাদেশে বর্তমান যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে- তা হলো ব্রিটিশ ঔপনৈবেশিক ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা। ইংরেজ শাসকরা এই দেশের জনসাধারণকে বিজ্ঞান মনস্ক করে তোলার জন্যে আধুনিক শিক্ষা চালু করেননি। তারা এ দেশে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছিলেন তাদের আজ্ঞাবহ এক শ্রেণীর তাবেদার ও কেরানিকুল সৃষ্টি করার জন্যে, শাসন কার্যে যাদের ভূমিকা হবে সহায়ক।

সেই ইংরেজ শাসকদের উত্তরসূরি পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর হাতেই প্রথম পড়লো এই দেশের জনসাধারণকে শিক্ষিত করার দায়িত্ব। সেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কখনই চাইতেন না দেশবাসীর সামনে খুলে যাক জ্ঞানের জগৎ তাই তারা বিভিন্নভাবে রুদ্ধ করতে চেয়েছে এই দেশবাসীর সৃজনশীলতা।

অতএব, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তদের কায়েমী স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি না করে ১৯৬৩ সাল থেকে কলেজ জাতীয়করণ শুরু করেন। আয়ুব খানের জাতীয়করণের মূলে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য ছিলো না। শিক্ষার মান উন্নয়ন কিংবা মেধা শক্তির বিকাশের জন্যে তারা কলেজ জাতীয়করণ করেননি। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিলো এক শ্রেণীর তাবেদার গোষ্ঠী সৃষ্টি করা যারা সর্ব অবস্থায় সরকারকে সমর্থন দিবে। কিন্তু তাদের সেই উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হয়নি- তার প্রমাণ আমরা দেখেছি। একথা সর্বজনবিদিত যে কোনো সরকারই আদর্শহীন কোনো ব্যবস্থা দীর্ঘ কালের জন্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। আয়ুব খান জাতীয়করণ শুরু করেন তার গদিকে চিরস্থায়ী করার জন্যে এবং জাতীয়করণের এই ঐতিহ্য স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশেও চলতে থাকে। কলেজ জাতীয়করণের সব চেয়ে হাস্যকর কৃতিত্ব এরশাদ সরকারের। কলেজ জাতীয়করণের নামে স্বেচ্ছাচারিতা চালিয়ে এরশাদ সরকার জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষাকে ধ্বংস করার এক অপচেষ্টায় লিপ্ত হন। শিক্ষার জগতে তারা প্রবেশ করিয়ে গেছে দুর্নীতির বিষবাষ্প। তারই প্রতিফলন আজ আমরা দেখতে পাই শতধা বিভক্ত শিক্ষক সমাজের মাঝে। আত্মীকৃত শিক্ষক ও কর্মকমিশন কর্তৃক নিয়োগকৃত শিক্ষকদের মধ্যে আজ দেখা দিয়েছে চরম বৈষম্য। আপাতদৃষ্টিতের মনে হয় আত্মীকৃত শিক্ষকরা সংখ্যায় বেশি ও সরকারের ক্ষমতার কাঠামোর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক গভীর কেনো না তারা যে আত্মীকৃত। সরকারের ক্ষমতার কাঠামোর সঙ্গে তাদের রয়েছে রক্তের সম্পর্ক। যে সমাজের রক্তের সম্পর্কের মূল্য বেশি সেই সমাজকে সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় আদিম ও অসভ্য সমাজ আখ্যায়িত করা হয়। আমরা বোধহয় এখনও সেই আদিম ও অসভ্য সামাজিক স্তরেই রয়ে গেছি। তা না হলে যারা তাদের নিজস্ব মেধা ও বুদ্ধি বলে প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হয়ে চাকরি জীবনে প্রবেশ করলো তাদের পদমর্যাদা আত্মীকৃত শিক্ষকদের চাইতে কম কেন? আজ তারা হতাশা ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। কারণ তারা যে যোগ্যতা ও মেধাবলে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় সেই যোগ্যতা ও মেধা থাকা না সত্ত্বেও পদোন্নতির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পায় আত্মীকৃত শিক্ষকরা। বিষয়টি মনে হয় পরিষ্কার করা প্রয়োজন। আত্মীকৃত শিক্ষকদের বেসরকারি কলেজে যোগদানের যোগ্যতার কোনো নির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই। শুধুমাত্র কলেজ জাতীয়করণের পর স্নাতকোত্তর পর্যায়ে দ্বিতীয় শ্রেণী থাকতে হবে যদি দ্বিতীয় শ্রেণী না থাকে তবে পুনরায় পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণী অর্জন করতে হবে। তা না হলে পদোন্নতি হবে না। কিন্তু তিনি চাকরিচ্যুত হবেন না। কিন্তু সরকারি কর্মকমিশন কর্তৃক নিয়োজিত একজন শিক্ষকের চাকরিতে যোগদানের ন্যূনতম যোগ্যতা হলো সকল পাবলিক পরীক্ষায় সম্মানসহ দ্বিতীয় বিভাগ। এখানে তার মান উন্নয়ন পরীক্ষা দেবার কোনো সুযোগই নেই। একজন সরাসরি নিয়োগকৃত শিক্ষক চাকরি জীবন শুরু করেন শূন্য থেকে। অন্যথায় আত্মীকৃত একজন শিক্ষকের যদি সব কয়টা পাবলিক পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণীও থাকে তবেও কলেজ জাতীয়করণের পরে তার চাকরির বয়সসীমা গণনা করা হয় ধারণাগত জ্যেষ্ঠতা থেকে। অর্থাৎ কেউ কর্ম কমিশনের নির্ধারিত যোগ্যতার অধিকারী না হয়েও বেসরকারি কলেজে দশ বছর চাকরি করেন তবে যেদিন কলেজ জাতীয়করণ করা হয় সেদিন তার চাকরি বয়স হবে পাঁচ বছর। কি আশ্চর্য এক বিধি এই সভ্য পৃথিবীতে। একজন মেধাবী শিক্ষক চাকরি শুরু করেন শূন্য থেকে আর একজন আত্মীকৃত শিক্ষক চাকরি শুরু করেন ধারণাগত জ্যেষ্ঠতা থেকে। ধারণাগত জ্যেষ্ঠতার বিষয় পদোন্নতির বেলায় বিবেচিত হওয়া আর নিজেকে সভ্য সমাজের সদস্য হিসাবে গণ্য করার অর্থ হলো সম্পূর্ণ বিপরীত। বর্তমান উন্নত বিশ্বের সমাজে দেখা যায় মেধা, যোগ্যতা ও কর্মকুশলতাই প্রধান্য পেয়ে থাকে যা কি না গণতন্ত্র, পুঁজিতন্ত্র ও বিজ্ঞানমনষ্ক সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ।

ধারণাগত জ্যেষ্ঠতার উদ্ভাবন করেন এরশাদ সরকার। এর ফলে প্রভাষক থেকে সহকারি, সহকারি থেকে সহযোগী এবং অধ্যাপক পদের প্রতিটি ধাপের বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন মেধাবী শিক্ষকগণ। এখানে আরো একটি বিস্ময়কর ব্যাপার হলো আত্মীকৃত কোনো শিক্ষকের যদি কোনো একটি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী থাকে তবে তার চাকরিকাল গণনা হয় শতকরা একশত ভাগ। অর্থাৎ বেসরকারি কলেজে তিনি যদি কলেজ জাতীয়করণের পূর্ব দশ বছর চাকরি করেন তবে তার চাকরি কলেজ জাতীয়করণের দিন দশ বছরই হবে। অন্যদিকে কর্ম কিমশন কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন শিক্ষকের যদি সব কয়টি পাবলিক পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী এবং পিএইচডি ও গবেষণামূলক প্রকাশনাও থাকে তাহলেও তার চাকরিকাল গণনা করা হবে সেই শূন্য থেকেই। অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে মেধাবী শিক্ষকগণ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে অপরাধ করে বসেছে। এরশাদ সরকার ১১৮টি কলেজ জাতীয়করণ করেছে কিন্তু পদ সৃষ্টি করেননি। অতএব ধারণাগত জ্যেষ্ঠতার নীতিমালার দরুন মেধাবী শিক্ষকদের জন্যে সংরক্ষিত পদও দখল করে নিচ্ছে আত্মীকৃত শিক্ষকগণ। এর ফলে শিক্ষাঙ্গনে দেখা দিচ্ছে মেধাশূন্যতা ও বন্ধ্যাত্ব। শিক্ষার গুণগত মানকে ধ্বংস করার অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন স্বৈরশাসক। তৃতীয় বিশ্ব থেকে মেধা পাচারের সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের এটি একটি অন্যতম কৌশল। মেধাবী ছাত্ররা ভবিষ্যতে আর সরকারি কলেজে শিক্ষকতায় আসবে না, হয় তারা হবে দেশান্তর তা না হলে যোগ দিবে বেসরকারি সংস্থায়। দেশ ও জাতি বঞ্চিত হবে মেধাবী শিক্ষকদের সেবা থেকে। শিক্ষার গুণগত মান না থাকার দরুন-সৃজনশীলতার পথ হবে রুদ্ধ যার ফল হবে সুদূরপ্রসারী।

বর্তমানে কতিপয় কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী শিক্ষার মানকে ধ্বংস করার জন্যে আর একটি গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। বর্তমানে তাদের দাবি বেসরকারি কলেজে তাদের চাকরিকালের পুরোটাই গণনা করতে হবে। এই স্বার্থান্বেষী মহল চাইছে সমগ্র জাতি যেন আবার সেই মধ্যযুগের অন্ধকারে ফিরে যাক। কারণ তারা মেধা ও সৃজনশীলতার বিকাশ চান না। অর্থাৎ বাংলাদেশ যে সভ্য পৃথিবীর কাছে আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসাবে পরিগণিত হোক এটা তারা চান না। তা হলে তারা জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষাকে ধ্বংস করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হতেন না। এতে লাভবান হবে কায়েমী স্বার্থবাদী কতিপয় ব্যক্তি। তার সমগ্র জাতির হবে অপূরণীয় ক্ষতি।

অবাধ প্রতিযোগিতা, সৃজনশীলতা, বুদ্ধির শক্তি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র, শ্রেণী সম্পর্ক ইত্যাদি উদারনৈতিক সব তত্ত্বই অর্থহীন হয়ে যাবে সমাজবিজ্ঞানের রক্তের তত্ত্বের নিকট। তাই যদি হয় তবে সমস্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা তুলে নেওয়াই কি বাঞ্ছনীয় নয়?

সুলতানা আয়েশা
৪ক, মোমেনবাগ
রাজারবাগ, ঢাকা